হার্ড ইমিউনিটি’র নামে বিধি না মানা বোকামি

মানবেশ সরকার

27 Aug 2020,

ভারতে এখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রতিদিন মৃতের সংখ্যাও হাজারের আশপাশে ওঠানামা করছে। গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছে কি হয়নি, তাই নিয়ে চলছে বিতর্ক।

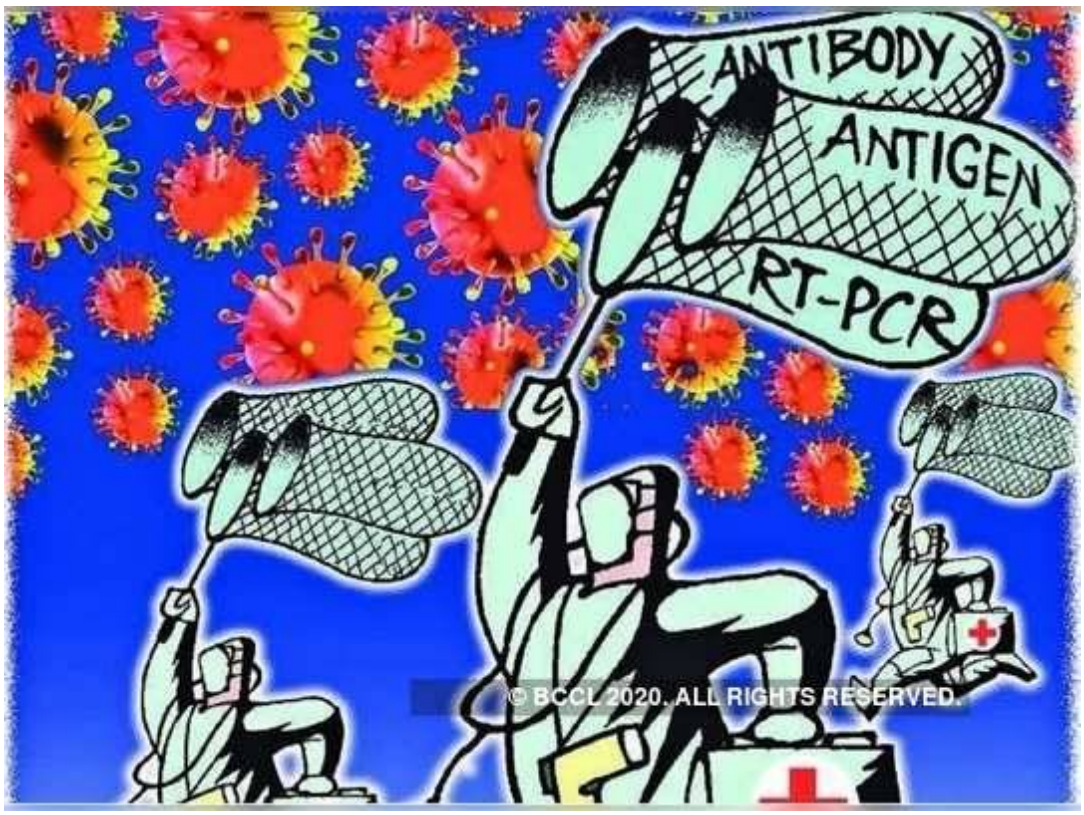

প্রতীকী ছবি।

ভারতে এখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রতিদিন মৃতের সংখ্যাও হাজারের আশপাশে ওঠানামা করছে। গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছে কি হয়নি, তাই নিয়ে

চলছে বিতর্ক। এরই মধ্যে লক-ডাউনের প্রেক্ষিতে চর্চায় আসা একটি শব্দবন্ধ 'হার্ড ইমিউনিটি', বাংলা তর্জমায় 'গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা', নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে অবশ্য আগে থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও বলে গিয়েছেন যে, 'কোভিড ১৯' নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবার দরকার নেই; একে সাথে নিয়েই চলতে হবে; 'হার্ড ইমিউনিটি'ই একমাত্র সমাধান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন শব্দবন্ধটি ব্যবহারের পর ব্রিটেনে অনেক হইচই হলেও ভারতে তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে এখন 'কোভিড ১৯' মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে আর আটকে না থাকায় 'হার্ড ইমিউনিটি' নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে গিয়েছে। 'হার্ডইমিউনিটি'র প্রবক্তাদের বক্তব্য, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শৃঙ্খল ছিন্ন করা আসলে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা; তাই 'হার্ড ইমিউনিটি' ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'হার্ড ইমিউনিটি' গড়ে উঠতে পারে দু'ভাবে - বেশির ভাগ মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ওঠার মাধ্যমে অথবা টিকা গ্রহণের মাধ্যমে। এই দুইয়ের কোনও এক পদ্ধতিতে বেশির ভাগ মানুষের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হলে, বাকিদের তাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। যেহেতু 'কোভিড ১৯' এর টিকা নিয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলার সময় আসেনি, তাই 'হার্ড ইমিউনিটি' গড়ে ওঠার একমাত্র উপায় হল, বেশিরভাগ মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়া- বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী, অন্তত ৬০ শতাংশ মানুষের আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়া। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যার অর্থ দাঁড়ায়, প্রায় ৮০ কোটি মানুষের আক্রান্ত হওয়া- কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে যা মেনে নেওয়া কঠিন।

তর্কের খাতিরে যদি মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, গুজরাট বা পশ্চিমবঙ্গের মতো বেশি সংক্রমিত রাজ্যগুলির কথাই শুধু ধরা হয়, তাহলেও 'হার্ড ইমিউনিটি'র জন্য প্রয়োজনীয় আক্রান্তের সংখ্যাটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য মহারাষ্ট্রের জন্য তা ৭.৫ কোটির মতো, তামিলনাড়ু, কর্নাটক বা গুজরাটের মতো রাজ্যের জন্য তা ৪ কোটির আশপাশে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য তা ৬ কোটির মতো ইত্যাদি। তবে এই সংখ্যাগুলি বিব্রত করতে পারত না, যদি আশঙ্কাজনক রোগীর সংখ্যা নগণ্য হত। শতাংশের হিসাবে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে আশঙ্কাজনক রোগীর অনুপাত বেশি না হলেও (৫-৬ শতাংশ) ভারতের মতো দেশে মোট সংখ্যার হিসাবে তা কম হবে না। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৪০ লক্ষের কাছাকাছি, তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে ২০ লক্ষের উপরে

বা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষের মতো। উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ না পেলে যা বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর করোনার সাথে লড়াইয়ে যারা শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করবেন তাঁদের সংখ্যাটা সর্বনিম্ন মৃত্যুহার ধরে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারে ২ লক্ষের উপর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২ লক্ষের কাছাকাছি আর দিল্লির মতো শহরের ক্ষেত্রে ৪০ হাজারের উপর (বিভিন্ন দেশের সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী করোনায় সংক্রমিতদের মৃত্যুহার ০.৩-১ শতাংশ)। সরকারি তথ্যের সীমাবদ্ধতাকে মেনেই বলা যায় যে, বাস্তব অবস্থাটা এখনও এই সংখ্যাগুলির থেকে অনেক দূরে।

এই লেখা লেখার সময় মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ বা দিল্লিতে মোট মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০,০৩৭, ২,৪২৮ ও ৪,১৯৬। রাজ্যগুলির রক্তরস সমীক্ষার ফলাফল থেকে অনুমান করা যায় যে, 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জনের জন্য এই রকম অনেক মৃত্যু এখনও অপেক্ষা করে আছে। বিজ্ঞানের পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের কাছে যা একসময় ছিল অনিবার্যতা, কিছু মানুষ এখনও সেটাই সমাধান ভাবছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে যাঁরা সুস্থ হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগেরই অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (অ্যান্টিবডি) তিন মাসের বেশি স্থায়ী হচ্ছে না, যা 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জনের ক্ষেত্রে ফুটো চৌবাচ্চায় জল ভরার আশঙ্কা তৈরি করছে।

এখন 'হার্ড ইমিউনিটি'র বিপরীতে যদি করোনাকে মোকাবিলা করার 'হু'র পরামর্শগুলিকে বিচার করা হয়, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, 'হু'র কিছু দুর্বলতা থাকলেও করোনার সংক্রমণ শৃঙ্খল ছিন্ন করার ভাবনাতে জীবনহানির সম্ভাবনা কম। মাস্কের ব্যবহার, সাবান জলে হাত ধোওয়া বা তিন ফুট দূরত্ব বিধিসহ ব্যাপক মাত্রায় পরীক্ষা, আক্রান্তদের চিকিৎসা এবং আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষদের খুঁজে বের করে নিভৃতবাসের যে পরামর্শ 'হু' দিয়েছে, তাকে গুরুত্ব দিয়ে কোনও কোনও দেশ করোনাভাইরাসের আক্রমণকে ভালো ভাবেই সামলে দিয়েছে।

৩০ জানুয়ারি ভারতে যখন প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে, সে সময় চিনকে বাদ দিয়ে ১৮টি দেশে সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছিল। এই ১৮টি দেশের অন্যতম দু'টি দেশ ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়াতে এই লেখা লেখার সময় পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৫১ ও ২৭৩ এবং মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ ও শূন্য। এমনকী যে দক্ষিণ কোরিয়াতে (এই ১৮টি দেশের অন্যতম) এক সময় করোনার সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছিল, সেখানেও ব্যাপক মাত্রায় পরীক্ষার নীতি অনুসরণের

ফলে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। করোনার উৎসস্থল চিনের সাফল্যের কথা না হয় অনালোচিতই রইল।

বিপরীতে এই ১৮টি দেশের মধ্যে যে দেশটি হু'র পরামর্শ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করেছে সেই আমেরিকাতে ৩০ শে জানুয়ারি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫, যা বর্তমানে কয়েক মিলিয়নে পৌঁছেছে এবং মৃতের সংখ্যা দেড় লক্ষ পেরিয়ে দু' লক্ষের দিকে এগোচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, যে দেশ যত বেশি হু'র পরামর্শকে অবহেলা করেছে, সে দেশ করোনার বিপদকে তত বেশি প্রত্যক্ষ করেছে। শুরুতে ইতালি যদি এই অবহেলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়, বর্তমানে আমেরিকা ও ব্রাজিলের পিছনে ভারতও তার একটি উদাহরণ হতে চলেছে। ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক করোনায় আক্রান্ত দেশ- আক্রান্ত ২.৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং মৃত্যু ৫০,০০০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই করোনাকে মোকাবিলার প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবহেলাকে বিরোধিতা না করে 'হার্ড ইমিউনিটি'র তত্ত্বকে গেয়ে বেড়ানোর মধ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্বহীন আচরণকেই সঙ্গ দেওয়া হয়।

এটা ঠিক যে নভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে বহু কিছুই এখনও আমাদের অজানা, তাই এই সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে এই সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত যতটুকু আলোকপাত করতে পেরেছে তার উপর দাঁড়িয়ে এটা বলা যায় যে ভারতকেও কিন্তু ভিয়েতনাম বানানো যেত যদি যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপগুলি নেওয়া হত। ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালা তার দৃষ্টান্তও তৈরি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অবহেলার কারণে আমরা সে সুযোগ হারিয়েছি।

কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন ঘোষণার জন্য যে উদ্যোগ দেখিয়েছে তা যদি শুরুতেই আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীদের বাধ্যতামূলক নিভৃতবাস, ব্যাপক মাত্রায় পরীক্ষার মাধ্যমে আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের সংস্পর্শে আসা মানুষদের খুঁজে বের করার জন্য দেখাত, তা হলে আজ হয়তো আমরা এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়তাম না। আমরা নাগরিকরাও কেউ কেউ মনে করেছিলাম যে, যে দেশে অপুষ্টিকে অবহেলা করা হয়, সে দেশে করোনারও অবহেলাই প্রাপ্য! ফলে আজ মানুষ যখন হাসপাতালে ভর্তি না হতে পেরে বা সময় মতো চিকিৎসা না পেয়ে মারা যেতে শুরু করেছেন, বা প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন, তখন আতঙ্কিত

হওয়া ছাড়া বিশেষ কিছুই করার থাকছে না। মহামারী বা অতিমারী মোকাবিলার জন্য আমাদের দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামো যে একবারেই অনুপযুক্ত, এ কথা কিন্তু সকলেরই জানা ছিল।

পৃথিবীতে বহু রোগই আছে যার ওষুধ বা টিকার আবিষ্কার হয়নি। ডেঙ্গি তার অন্যতম উদাহরণ। জনস্বাস্থ্যের নীতিই এই রোগগুলিকে সামলানোর প্রকৃত উপায়। করোনার ক্ষেত্রেও তাই জনস্বাস্থ্যের নীতি অনুসরণ করে হু'র পরামর্শমতো করোনার সংক্রমণ শৃঙ্খল ছিন্ন করা এবং সংক্রমণের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনার জন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়াই ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু এই কাজে অবহেলা করে ভারত রাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক সহোদরদের সাথে হাত মিলিয়ে পুঁজির মুনাফার জন্য টিকা/ওষুধের ব্যবসার রাস্তা খুলে দিয়েছে। আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করে টেলিভিশন এই কাজে সহায়ক হয়েছে। দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে আমাদের কিছু সহনাগরিকও 'হার্ড ইমিউনিটি'র তত্ত্ব খাঁড়া করে প্রকারান্তরে রাষ্ট্রকেই মদত দিয়েছে।

লেখক প্রতীচী ইনস্টিটিউট'এ কর্মরত।

মতামত ব্যক্তিগত